মেম্ফিস এবং টোপেকায়

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

দ্বিতীয় প্রবাস -২৮

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের IBA তে আমার কর্ম জীবনের শুরু থেকেই আমি ডঃ নাজমুল আবেদীনকে চিনি। পলিটিকাল সায়েন্সের নবীন প্রভাষক নাজমুল আবেদীন সাহেব ছিলেন IBA তে আমার সিনিয়র সহকর্মী জনাব রহিম বক্স তালুকদারের বিশেষ বন্ধু মানুষ। তবে তার সাথে পরিচয় গভীর হলো সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে। দেশে বিদেশে বহু পরিস্থিতিতে, বহ মানুষের সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য (এবং দূর্ভাগ্যও) আমার হয়েছে; কিন্তু ডঃ নাজমুল আবেদীন সাহেবের মতো বন্ধু বৎসল লোক আমি আর দেখিনি এবং আর দেখবো সে আশাও করি না। আত্মীয় পরিজনহীন খার্তুমের সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে গিয়ে বাসা-বাড়ী, আসবাবপত্র নিয়ে গুছিয়ে বসা এবং তার পর সোনিয়ার স্কুলে ভর্তি করা জাতীয় যাবতীয় কাজে ডঃ আবেদীন এবং তার স্ত্রী ফরিদা শিরিনের সহায়তা কোনদিনও ভোলার নয়। তারা নিজেদের অসুবিধার কথা চিন্তা না করে অন্যদের সাহায্য করতেন। আর তাদের সাহায্য সহায়তা যে কেবল বাংলাদেশীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, সেটা ছিল সার্বজনীন। বৃটিশ, ভারতীয় এমনকি পাকিস্তানীরাও তার সাহায্য সহায়তা চেয়ে বঞ্চিত হয়েছে এমন কোন ঘটনার কথা মনে করতে পারছিনা। খার্তুম ছাড়ার পর তিনি জ্যামাইকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন এবং পরে আমেরিকা চলে আসেন। বর্তমানে তিনি ন্যাশভিলের অদুরে ক্লার্কসভিল শহরে Austin Peay State বিশ্ববিদ্যালয়ে Political Science এর অধ্যাপক।

সন্ধ্যে আটটা নাগাদ ডঃ আবেদিন শাহজাহান সাহেবের বাসায় এসে পৌঁছলেন। মেম্ফিস থেকে ন্যাশভিল প্রায় পৌনে চার ঘন্টার ড্রাইভ, আর ন্যাশভিল থেকে Adams নামের ছোট শহরে ওনার বাসায় যেতে লাগে আরো পয়তাল্লিশ মিনিটের মতো। এই দীর্ঘ পথের কথা বিবেচনা করে আমরা ঠিক করলাম তড়িঘড়ি খেয়েই পথে নামবো। কিন্তু চাইলেই তো আর সব কিছু হয়না। খার্তুম ছাড়ার প্রায় পঁচিশ বছর তিন পুরোনো বন্ধু একত্রে হয়েছি; গল্প করার জন্য কিছুটা সময়তো লাগবেই। তবে খাওয়ার সাথে গল্প চালিয়ে নেওয়ায় সোয়া ন'টার মধ্যেয় আমরা ন্যাশভিলের পথে রওয়ানা হতে পারলাম। এই তো মাত্র দু'তিন দিন আগেই এপথে আমরা মেম্ফিস এসেছিলাম, আজ ফিরে যাচ্ছি। দু'দিন আগেই এক বন্ধু যে শহর থেকে তুলে নিয়েছিলেন দু'দিন পরে আরেক বন্ধু আবার সেই একই শহরে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ করেই এক ধরণের দার্শনিকতা যেন মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো; সত্যি কি যে পথ দিয়ে এসেছিলাম আবার সে পথেই ফিরছি? পথের অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ অবশ্যই বদলায়নি; কিন্তু দু'দিন আগের আমি আর দু'দিন পরের আমি কি সত্যি কি এক অপরিবর্তিত পথিক?

বেশ গাল-গল্পের মধ্যে আমরা পথ চলছি। রাত আস্তে আস্তে গভীর হয়ে আসছে বলে রাস্তায় গাড়ী চলাচল অপেক্ষাকৃত ভাবে কম। মাঝে মাঝে প্রচন্ড শব্দ করে সুবিশাল ট্রাক চলে যাচ্ছে। গাড়ীর উইন্ডস্ক্রীনের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে গভীর হয়ে আসা আলো আঁধারীতে ছাওয়া রাতের প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য হামলে পরছে গাড়ীর ভিতর। মাঝে মাঝে ডঃ আবেদীন পথের বিভিন্ন ল্যান্ডমার্কের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। তবে গল্পের স্রোত ধারা কেমন যেন একটু নির্জীব হয়ে আসছে। সম্ভবতঃ ভরপেট খেয়ে পথে নামার কারণে চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসছিল। সংগত কারণেই কফি ব্রেক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। আবেদীন সাহেব হাইওয়ে থেকে এগজিট নিয়ে

নিকটতম রিফ্রেশমেন্ট এলাকায় কফি শপের পাশে গাড়ী থামালেন। বাইরে বেশ ঠান্ডা; তবে একটু হাটাহাটি করে হাত-পায়ের জড়তা কাটানোর জন্য বেশ উপযোগী।

এই সাবাটিকালের ছুটিতে আমার অস্ট্রেলিয়ান সহযোগী ইয়ান বেন্টনের সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হোত। তার প্রতি চিঠিতেই সে জানতে চাইতো "How are you doing in the land of bad coffee" - আমি এই পঁচা কফির দেশে কেমন আছি। আসলে অস্ট্রেলিয়ার সুস্বাদু ক্যাপুচিনু কফি পানে অভ্যস্ত যে কারো পক্ষেই আমেরিকান কফি অখাদ্য লাগে। তাই এই প্রবাসে আমি পারতপক্ষে কফি নিইনা। তবে আজকে নিলাম এবং বড়ই উপকৃত হলাম; সে কফির এমনই জঘন্য স্বাদ যে তার প্রথম চুমুকেই আমার চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেল। বাকী পথটা খার্তুমের নানারঙ্গের দিনগুলির স্মৃতির জাবর কাটতে কাটতে রাত দুটোয় আবেদীন সাহেবদের বাসায় এসে পৌঁছলাম। আরেকদফা আড্ডাবাজী করে যখন শুতে গেলাম তখন সকাল চারটা।

নতুন জায়গা বলেই কিনা জানিনা দশটার মধ্যেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। শিরিন ভাবী ততক্ষণে যাকে বলে ষোড়শোপচারে নাস্তার আয়োজন করে ফেলেছেন। পরোটা, মাংস থেকে শুরু করে মিষ্টি, ফল কি সেখানে নেই। খার্তুমে থাকাকালীন সময়ে খানেওয়ালা বলে আমার মোটামুটি খ্যাতি ছিল, যারা আমাকে নিমন্ত্রন করতেন তারা অতিথির সংখ্যা গনণায় আমাকে 'আড়াইজন' ধরে হিসেব করতেন। গত পঁচিশ বছরে গায়ে গতরে -বিশেষতঃ গতরের মধ্যপ্রদেশে আমার যা সমৃদ্ধি হয়েছে তা দেখেই সম্ভবতঃ শিরিনভাবীর এই বিশাল আয়োজন। কিন্তু তিনি তো আর জানেন না যে সমৃদ্ধিটা শুধু গতরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; আমার রক্তচাপ, কোলেস্টরল ইত্যাদিও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। মায়ের ডায়েবেটিসের সমস্যা দেখে ভয়েই মিস্টি খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি। কাজেই গুনতিতে আমাকে এখন আধা থেকে পৌনে একজনের বেশী ধরার কোন কারণ নেই। তাই নাস্তার টেবিলে বসে ভাবীকে নিরাশ করতে হোল।

নাস্তার টেবিলে বসে আমাদের আগামী দুদিনের কর্মসূচী ঠিক করা হলো। সেই কর্মসূচী অনুযায়ী ঘন্টা খানেকের মধ্যে আমরা বাসা থেকে বের হয়ে আবেদীন সাহেবদের Adams শহর ঘুরে ফিরে দেখলাম। এর পর গেলাম Clarkesville ওনার কর্মস্থল Austin Peay বিশ্ববিদ্যালয়ের Fort Campbell ক্যাম্পাস দেখতে। এই ক্যাম্পাসটির ছাত্র-ছাত্রীরা আমেরিকান সেনাবাহিনীর লোক বিধায় নিরাপত্তা জনিত কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ঢোকা গেল না। বিশাল ক্যাম্পাসের চৌহদ্দির বাইরে দিয়ে ঘুরেফিরে আমরা চলে এলাম ন্যাশভিল শহরের urban পার্কে অবস্থিত পার্থেনন দেখতে। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দ টেনেসি স্টেটের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রাচীন গ্রীসের পার্থেননের হুবহু অনুকরণে এই বিশাল ভবনটি তৈরী করা হয়। এর ভিতরে জ্ঞান, যুদ্ধ, শিল্প, সংস্কৃতি, ন্যায়বিচার এবং দক্ষতার গ্রীক দেবী এথেনার ৪২ ফুট উঁচু মুর্তি রয়েছে। ন্যাশভিলের পার্থেনন বর্তমানে শিল্পকলার যাদুঘর হিসেবে পরিচিত। এর ভিতর ১৯ এবং ২০ শতকের আমেরিকান শিল্পীদের বেশ কিছু শিল্পকর্ম মজুদ আছে। পার্থেনন থেকে ফেরার পথে আমরা আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ Vanderbilt বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে ড্রাইভ করে এলাম। নভেম্বর ডিসেম্বরের সে সময়টায় আমেরিকার বাংগালি মহলে মোটামুটি ভাবে চাউর ছিল যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র গ্রামীন ব্যাংক খ্যাত বাংলাদেশের অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস নাকি অর্থনীতিতে এ বৎসর নোবেল প্রাইজ পাবেন।

পরদিন আমরা গেলাম ন্যাশভিলের বিশেষ আকর্ষণ Gaylord Opryland Resort & Convention Center দেখতে। ন্যাশভিল আমেরিকার কান্ট্রি মিউজিকের রাজধানী। প্রতি শনিবার রাতে এই ন্যাশভিল থেকে প্রচারিত আমেরিকার স্বনামখ্যাত Country Music Radio Program Grand Ole Opry র প্রচারকেন্দ্রের কাছে অবস্থিত ৪০ একর জায়গা বস্তৃত এই মনোরম এবং নয়নাভিরাম Resort এলাকাটি ভেতরে রয়েছে বারোটি চির হরিৎ বাগান, কুলকুল শব্দে বয়ে যাওয়া স্রোতধারা এবং তা পার হওয়ার সেতু এবং

জলপ্রপাত। প্রতিদিন এটি দেখতে হাজার হাজার লোক সমাগম হয়ে থাকে। প্রায় আধা বেলা ধরে দেখেও মনে হোল জায়গাটা খুব ভালো ভাবে দেখা হলো না। ক্রিসমাস আসছে বলে সুন্দর আলোক মালায় সাজানো ছবির মতন resort টি ছেড়ে আমরা যখন বাসার দিকে রওয়ানা

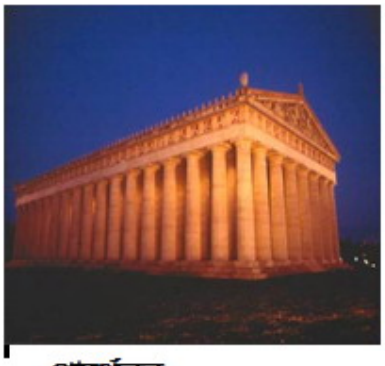

পার্থেনন

গ্রীক দেবী এথেনা

চির হরিৎ বাগান

হলাম তখন রাত প্রায় ন'টা বাজে। এই শহরে দেখার আরো অনেক কিছুই ছিল; কিন্তু এ যাত্রায় আর কিছু দেখা সম্ভব নয়। সেই রাত আর পরদিন সকালটা আমরা গল্প করে কাটালাম। দুপুরে ডঃ আবেদীন আমাদেরকে ন্যাশভিল বিমান বন্দরে নামিয়ে দিলেন। আমরা সে রাতেই নিউ ব্রানস উইক ফিরে এলাম।

রাটগার্স ইউনিভার্সিটি তথা নিউ ব্রানস উইক ছেড়ে সোনিয়ার বাসায় চলে যাওয়ার আগে আমাদেরকে আরো একটা জায়গায় যেতে হবে আর সেটা হচ্ছে কানসাস স্টেটের রাজধানী টোপেকা (TOPEKA)। যার বাড়ীতে যাবো তার নাম রেহান রেজা। আমরা দুজনে নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা হলেও রেজার সাথে আমার পরিচয় সিংগাপুরে। আমি তখন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিংগাপুরে অধ্যাপনা করছি। আর সেই সাথে সিংগাপুর বাংলাদেশ সোসাইটি নামে প্রবাসী বাংগালীদের সংগঠনটির সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত আছি। সে বছর আমার পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক 'শাস্তি' মঞ্চস্থ করার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে। শিল্পী নির্বাচনের নির্ধারিত দিনে শহীদ (এর কথা আগে বলেছি) একটি নুতন এবং অত্যন্ত সুদর্শন ছেলেকে নিয়ে এলো এবং বললো 'রাযযাক ভাই, ওর নাম রেজা। আপনার শহরেরই ছেলে; খুব ভাল অভিনয় করে'। আলাপ করে জানা গেল রেজা নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা আফজাল ভাই এবং স্কুল জীবনে আমার এক বছর সিনিয়র ছাত্র নুরুল হক ভাইয়ের ভাগ্নে। অডিশনের পর ওকে ছোটভাইয়ের চরিত্র দেওয়া হোল। শাস্তি নাটকে রেজার বড়ভাবীর চরিত্রে ছিল নাসিম। নাটক শেষ হলো তবে রেজার কাছে নাসিম বড়ভাবীই রয়ে গেল এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের রেজা আঙ্কল হয়ে গেল।

রেজা ছিল নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজের ছাত্রনেতা। কি যেন একটা রাজনৈতিক ঝামেলায় জড়িয়ে ওকে দেশ ছাড়তে হয়। সিংগাপুরে থাকাকালীন সময়েই সে ঝামেলা মিটে যায়। ও আমেরিকার কোন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, এবং আমাদের পাড়ার মেয়ে সাবরীনাকে বিয়ে করে আমেরিকা চলে আসে। তার পর বহু বছর আর রেজার সাথে কোন যোগাযোগ ছিল না। শেরিফের বিয়েতে ওকে আমন্ত্রন জানানোর জন্য বেশ কসরৎ করে ঠিকানা জোগাড় করে ওর সাথে যোগাযোগ করি। ও বিয়েতে আসতে পারেনি, কিন্তু আমাদেরকে ওর ওখানে যাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে।

ডিসেম্বরের ১৩ তারিখ, বুধবার সকালে আমরা টোপেকার উদ্দেশ্যে নিউ ব্রানস উইক ত্যাগ করলাম। নিউইয়র্ক থেকে প্রথমে সেন্ট লুইস এবং এবং সেখানে প্লেন বদল করে কানসাস সিটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছতে প্রায় দেড়টা বেজে গেলো। রেজা আগে থেকেই এয়ারপোর্টে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। কানসাস সিটি থেকে

টোপেকা প্রায় ষাট মাইল। কিন্তু রেজার বিলাসবহুল গাড়ীর নরম সীটে বসে গল্প করতে করতে কখন যে সে দূরত্ব পার হয়ে এলাম বুঝতেই পারলাম না। টোপেকা শহরের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত এলাকায় ওর চারতলা বিশিষ্ট প্রাসাদোপম বাসায় আসতেই ওর বৌ সাব্রীনা আমদের স্বাগত জানালো। আমাদের পাড়ার মেয়ে সাব্রিনা আমাদের কাছে ছোট বোন 'সাইয়া'। ও এমন আন্তরিক ভাবে আমাদের গ্রহন করলো মনে হলো আমরা যেন বহুদিন পরে বোনকে দেখতে আসা বড় ভাই-ভাবী।

রেজার বিশাল বাড়ী আর তার সাজ সজ্জা দেখে আমাদের রীতিমত ভিরমি খাওয়ার জোগার। শুনেছিলাম ও আমেরিকাতে ব্যবসা বাণিজ্য করে বেশ আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করেছে কিন্তু সে অর্জনটা যে কতটুকু সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। আমেরিকায় ওর জীবন সংগ্রামের কাহিনী সত্যি চমকপ্রদ। অন্যান্য বহু অভিবাসীর মতো সামান্য কিছু ডলার পকেটে নিয়ে আমেরিকায় এসে ও নানা ধরণের কাজ কর্ম করে বেশ কষ্টেই পড়াশুনা শেষ করে। এর পর আমেরিকার ফাষ্ট ফুড চেইন Churches Fried Chicken এর করপোরেট অফিসে রেজা একটি বেশ সন্মানজনক চাকুরী পায়। আর এখানে কাজের সুবাদেই ওর সুযোগ আসে এই কোম্পানীর franchisee হয়ে Churches Fried Chicken এর একটি দোকান খোলার। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি; কানসাস এবং মিসৌরী স্টেটে ওর এখন মোট সাতটি দোকান। প্রতিটি দোকান বেশ ভালো চলছে। ওর দোকানে বাংলাদেশী, ভারতীয়, পাকিস্তানী এবং মেক্সিকান মিলে প্রায় পন্ত্রাশজন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ ছাড়া ওর Real Estate এর ব্যবসাও রয়েছে। আর্থিক ভাবে ও অত্যন্ত সফল একজন মানুষ; কিন্তু ওর আচার ব্যবহারে তার কোন প্রকাশ নেই। আমার দীর্ঘ প্রবাস জীবনে আমি প্রচুর আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল কিন্তু আচার আচরণে দাম্ভিক এবং আত্মম্ভরী বাংগালী দেখেছি; রেজা তার সম্পুর্ন ব্যতিক্রম।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভাবেও রেজা অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত। কানসাস সিটি এবং এর আশেপাশের শহর গুলিতে ওকে সবাই একনামে চেনে। এখানকার সাংস্কৃতিক অংগনে ওর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান সর্বজন স্বীকৃত। এর সবচেয়ে বড় প্রমান এই যে ২০০৫ -২০০৬ সালে রেহান রেজা FOBANA র (Federation of Bangladeshi Associations in North America) কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিল। এখনো সময় সুযোগ পেলে ও অভিনয় করে। ব্যবসায়ের এত ব্যস্ততার মাঝেও ও ভিডিও ফটোগ্রাফি এবং চিত্র সম্পাদনার উপর ট্রেনিং নিয়েছে এবং কয়েকটি গানের ভিডিও প্রকাশ করেছে এবং ভবিষ্যতে আরো প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। এত বছর দেশের বাইরে থেকেও সাংস্কৃতিক মন-মানসিকতায় রেজা আজো একজন শাশ্বত বাংগালীই রয়ে গেছে। তবে রাজনীতির ব্যাপারে ওর দর্শন অধিকাংশ প্রবাসী বাংগালীর চেয়ে ভিন্ন। ও আওয়ামী লীগ, বি এন পি বা অন্য কোন রাজনৈতিক দল বা বাংলাদেশী রাজনীতির সাথে যুক্ত নয় এবং সে ব্যাপারে আগ্রহীও নয়। রেহান রেজা আমেরিকান ডেমোক্রাটিক পার্টির সাথে জড়িত; ও কানসাসের ইন্ডিয়ান আমেরিকান ডেমোক্রাটিক পার্টি ককাসের প্রেসিডেন্ট। এ ছাড়াও ও টোপেকার রোটারী ক্লাব এবং চেম্বার অব কমার্সের সাথে জড়িত। আমাদের তিন দিনের টোপেকা অবস্থানকালে ও আমাকে কানসাসের 2nd District এর কংগ্রেস ওয়োমান ন্যান্সি বয়ডার Fund raising এর অনুষ্ঠান, ডেমোক্রাটিক পার্টির অফিস এবং এই ষ্টেটের ক্যাপিটাল বিলডিং দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। দেখে খুব ভালো লাগলো যে রেহান রেজাকে কানসাস স্টেটের গভর্নর, সিনেটার এবং ওর রাজনৈতিক দলের সবাই একডাকে চেনে এবং খুব ভালো জানে। এটা একটা বিশাল অর্জন, এবং আমার জানামতো খুব কম প্রবাসী বাংগালীরই এ ধরণের অর্জন আছে।

যদিও টোপেকাতে আমাদের অবস্থান খুবই কম সময়ের জন্য ছিল তবু রেজা আমাদের বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান দেখাতে কানসাস সিটিতে নিয়ে গেল। কানসাস সিটির কিছু অংশ কানসাস স্টেটে, কিছুটা মিসৌরী স্টেটে। এর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য সুন্দর

ফোয়ারা, লিবার্টি মেমোরিয়াল, ব্রডওয়ে ব্রীজ, ইউনিয়ন স্টেশন এবং আমেরিকার প্রাচীনতম শপিং মলগুলির একটি। সাইয়া এবং রেজার আতিথেয়তার কথা আমাদের চিরদিন মনে থাকবে। সব কাজ কর্ম বাদ দিয়ে রেজা আমাদেরকে এখানে ওখানে নিয়ে গেছে। আমার এক ভাগ্নী মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা রাফিয়া রাশু ওর স্বামী সন্তান নিয়ে কানসাসে থাকে। ওর সাথে দেখা হলোনা বলে দুঃখ করছিলাম; রেজা ওদের সাথেও আমাদের দেখা করিয়ে দিল। রেজা আর সাইয়ার দুটি সন্তান - বড়টি মেয়ে, বয়স তেরো এবং ছোটটি ছেলে, বয়স আট। কিন্তু এত প্রাচুর্য্যের মধ্যে থেকেও ওরা অত্যন্ত সাধারণ ভাবে মানুষ হচ্ছে; দেখে খুবই ভাল লাগলো।

লিবার্টি মেমোরিয়াল

ব্রডওয়ে ব্রীজ

ইউনিয়ন স্টেসন

এবার ফেরার পালা। ১৬ই ডিসেম্বর শনিবার সকালে নাস্তা খেয়ে আমরা টোপেকা থেকে রওয়ানা হলাম। সকালে প্রচন্ড কুয়াশায় আকাশ ঢাকা থাকায় একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। গত দু'তিনদিন ধরেই - বস্তুতঃ আমরা পৌছানোর পর থেকেই নাকি খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেন্ট লুই বিমান বন্দরে বিমান ওঠা নামা বিঘ্নিত হচ্ছে। এটা আমার জন্য ভয়ের সংবাদ; ১৮ তারিখে আমি যে বিষয়টি পড়াই তার শেষ পরীক্ষা। পরীক্ষার সময় হাজির থাকতে না পারলে ব্যাপারটা বড়ই বাজে হয়ে যাবে। যাই হোক, প্রকৃতির বিরূদ্ধে তো আমাদের করার কিছুই নেই। আর ডিসেম্বরে বেড়াতে বের হয়ে এই ধরণের বৈরী আবহাওয়া নিয়ে ভয় করে কোন লাভ নেই। শংকিত মনে গাড়ীতে উঠলাম। রেজা অভয় বানী শুনাতে শুনাতে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল। নাহ, আমাদের ফ্লাইট নিয়ে আপাততঃ চিন্তার কোন কারণ নেই; সেন্ট লুইস বিমান বন্দরে কোন অসুবিধা নেই। রেজার কাছে বিদায় নিয়ে আমরা চেক ইন করলাম। যথা সময়ে আমাদের ফ্লাইট আকাশে উড়লো। সেন্ট লুইসে সেদিন প্রচন্ড ঠান্ডা; প্লেন থেকে পরিস্কার ভাবে নীচের বিভিন্ন জলাশয়ে বরফ হয়ে যাওয়া পানি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ফ্লাইট চেঞ্জ করতে কোন অসুবিধে হলোনা। আমরা নিরূপদ্রবে নিউইয়র্কের লাগোয়ারডিয়া বিমান বন্দরে অবতরন করলাম। সেখান থেকে সেন্ট্রাল স্টেসনে এসে ট্রেন ধরে নিউ ব্রানস উইকে আমাদের বাসায় এসে যখন পৌছলাম তখন রাত দশটা বেজে গেছে। বাসায় ঢোকার কিছুক্ষনের মধ্যেই বেশ জোরেশোরে বৃষ্টি নামলো।

আপাততঃ বেড়ানোর পালা শেষ। তেইশ তারিখ সকালে আমরা মিডল্যান্ডে সোনিয়ার বাসায় যাবার উদ্দেশ্যে নিউজার্সির লিবার্টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে প্লেন ধরবো। বাইশ তারিখ রাতে মাহমুদ হাসান সাহেব সপরিবারে ঢাকা রওয়ানা হবেন। তাই ঠিক হয়েছে বাইশ তারিখ আমরা বাসা ছেড়ে দিয়ে বুলন্দদের বাসায় উঠে যাব এবং সকালে ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাব । সতেরো তারিখ সকাল থেকেই নাসিম আমাদের এই স্বল্পমেয়াদের সংসার গোটানোর কাজে মন দিল। এর পর খুব দ্রুত সময় কেটে গেলো। আঠারো তারিখ আমি যে বিষয়টি পড়াই তার পরীক্ষা হলো আর একুশ তারিখের মধ্যে খাতা দেখে ছাত্রদের মার্কস জমা দিলাম। বাইশ তারিখ সকালের মধ্যে মঞ্জুভাবী এবং বুলন্দের দেয়া বিভিন্ন সামগ্রী ফেরৎ দেয়া হলো। দুপুরের মধ্যে আমার কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এসে বাসার ফার্নিচার সমূহ নিয়ে গেল। বিকেলের মধ্যে বাসা পরিস্কার করে বাসার চাবী কর্তৃপক্ষের হাতে ফেরৎ দেয়া হলো। সন্ধ্যে বেলায় বুলন্দ এবং অনু এসে আমাদেরকে ওদের বাসায় নিয়ে গেল।

বুলন্দের বাসায় গিয়ে মাল পত্র নামাতে গিয়ে পা পিছলে পরে গিয়ে আমার পায়ের বেজায় রকম ফুলে গেল। গৃহস্বামী মুশতাক অর্থাৎ অনু তার পড়শী এক ডাক্তার বন্ধুকে খবর দিয়ে এনে তাকে আমার পা দেখালো। তিনি বললেন পা ভাংগেনি, তবে বেশ বাজেভাবে sprained হয়েছে এবং সারতে সময় লাগবে। পায়ের ব্যথায় রাতে ভালো ঘুম হলো না। পরদিন সকালে আবহাওয়া খুব খারাপ; প্রচন্ড বৃস্টি হচ্ছে আর সেই সাথে ঝড়ো বাতাস। এই খোঁড়া পা নিয়ে বিশাল লাগেজের বহর সমেত ট্যাক্সিতে উঠতে বেজায় কষ্ট হলো। কিন্তু কি আর করা। সাড়ে ন'টায় আমাদের বহনকারী ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের বোয়িং শিকাগোর উদ্দেশ্যে আকাশে উড়লো। জানালা দিয়ে নীচে তাকালাম। বৃষ্টির কারণে ভিজিবিলিটি জিরো, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য ভিজিবিলিটি ভাল থাকলেও কি কিছু দেখতে পেতাম? চোখটা তো বেশ ভিজে ভিজেই লাগছে।

(চলবে)

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)